# খুড়ীমা

(গল্পগ্রন্থ – জন্ম ও মৃত্যু)

খুব বর্ষা নামিয়াছে।

দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি।

আমি চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া অঙ্ক কষিতেছি। বেলা প্রায় দুপুর হইতে চলিল।বর্ষা-বাদল না হইলে বিনোদ-মাস্টারের কাছে ছুটি পাওয়া যাইত। কিন্তু কি বাদলাইনামিয়াছে আজ তিন দিন হইতে আমার ভাগ্যে।

এমন সময়ে কোথা হইতে একটা ময়লা-কাপড়-পরা লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠানে দাঁড়াইল এবং আমার দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিল। আজও মনে আছে—লোকটার গায়ে একটা ময়লা চিটচিট কামিজ, খালি পা, রুক্ষচুল। বয়স বুঝিবার উপায় নাই, অন্তত আমার পক্ষে।

আমি লোকটাকে আর কখনও দেখি নাই, কারণ বাবা-মা এখানে থাকিলেও, দিদিমা আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া এতদিন ছিলাম মামার বাড়িতেই। এ গ্রামেআমি আসিয়াছি বেশি দিন নয়। যখন চলিয়া গিয়াছিলাম তখন আমার বয়সমাত্র ছ-বছর।

বিনোদ-মাস্টার বলিল—কি পরেশ, কি খবর?

লোকটা উঠানে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে দেখিয়া বলিতে গেলাম—আসুন নাওপরে—

কিন্তু বিনোদ-মাস্টার আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—কি চাই পরেশ? লোকটাআর একবার কেমন এক ধরনের হাসিল। এই প্রশ্নের উত্তরে যে-ধরনের হাসা উচিতছিল তেমন নয়— যেন নিজের প্রশংসা শুনিয়া বিনীত ও লাজুক হাসি হাসিতেছে।ছেলেমানুষ হইলেও বুঝিলাম হাসিটা অসংলগ্ন ধরনের।

বলিল—খিদে পেয়েছে।

আমার জাঠতুতো ভাই শীতল বাড়ির ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উঠানেরদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে পরেশকাকা কোথা থেকে? কোথায় ছিলেনএতদিন?

লোকটি উত্তরে শুধু বলিল—খিদে পেয়েছে।

শীতল বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া এক বাটিমুড়ি আনিয়া লোকটির কোঁচার কাপড়ে ঢালিয়াদিল। আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছি লোকটা কে, এবং এত সম্মানসূচক সম্বোধন করিতেছে শীতল-দা অথচ বসিতে বলিতেছে না-ই বা কেন, এমন সময় লোকটা একটাকাণ্ড করিয়া বসিল। শীতলদার দেওয়া মুড়ির এক গাল মাত্র খাইয়া বাকিগুলি একবাররাইট্-অ্যাবাউট্টার্ন করিয়া ঘুরপাক খাইয়া উঠানময় কাদার উপর ছড়াইয়া ফেলিল— সঙ্গে সঙ্গে কি একটা দুর্বোধ্য ছড়া উচ্চারণ করিল গান করার সুরে—

গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
খোদার চাল গামছায় বাঁধি
গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
গুগ্‌লি ঝিনুক—
গুগ্‌লি ঝিনুক—

তখনও সে ঘুরপাক খাইতেছে ও ছড়া বলিতেছে, এমন সময় আমার জ্যাঠামশাইদুর্লভ রায় তিনি অত্যন্ত রাশভারী ও কড়া মেজাজের লোক—বাড়ির ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপের পাশে উঠান হইতে অন্দরে যাইবার দরজাতে দাঁড়াইয়া হাঁক দিয়া বলিলেন—কে চেঁচামেচি করে দুপুরবেলা? ও পাগলটা? মুড়িগুলো নিলে, তবে কেনও-রকম করে ফেললে যে বড়—বদমায়েশী করবার আর জায়গা পাওনি?

বলিয়া তিনি আসিয়া লোকটার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক ঘা চড় মারিলেন, পরে তাহাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিলেন, 'বেরোও এখান থেকে, আরকোনদিন দরজায় ঢুকেছ তো মেরে হাড় গুঁড়ো করব'—

আমার বলিষ্ঠ জ্যাঠামহাশয়েরধাক্কার বেগে রোগা ও পাতলা লোকটা খানিক দূরে ছিটকাইয়া গিয়া কাদায়-পিছল উঠানের উপর পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেল এবং একটু সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া মাটিতে একবারথুথু ফেলিল— রক্তে রাঙা।

ইতিমধ্যে মজা দেখিতে আমাদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানের দরজায় জড়ো হইয়াছিল— লোকটা ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেই তাহারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটার উপর সহানুভূতিতে আমার মনটা গলিয়া গেল।

পরেশ-কাকার সহিত এই ভাবেই আমার প্রথম পরিচয়।

ক্রমে জানিলাম পরেশ-কাকা এই গাঁয়েরই মুখুজ্যেবাড়ির ছেলে, পশ্চিমে কোথায় যেন চাকুরি করিত, বয়স বেশি নয়—এই মাত্র পঁচিশ। হঠাৎ আজ বছর-দুই মাথাখারাপ হওয়ার দরুন চাকুরি ছাড়িয়া আসিয়া পথে-পথে পাগলামি করিয়া ঘুরিতেছে।তাহাকে দেখিবার কেহ নাই, সে যে-বাড়ির ছেলে তাহাদের সকলেই বিদেশে কাজকর্মকরে, এখানে কেহ থাকে না, উন্মাদ ভাইকে বাসায় লইয়া যাইবার গরজও কেহ এ-পর্যন্ত দেখায় নাই। পাগল পরের বাড়ি ভাত চাহিয়া খায়, সব দিন লোক দেয় না, মাঝে মাঝে মার-ধরও খায়।

একদিন নদীর ধারে পাখির ছানা খুঁজিতে গিয়াছি একাই। আমায় একজন সন্ধান দিয়াছিল গাং-শালিকের অনেক বাসা গাঙের উঁচু পাড়ে দেখা যায়। অনেক খুঁজিয়াওপাইলাম না।

সন্ধ্যা হয়-হয়। রোদ আর গাছের উপরও দেখা যায় না। নদীর পাড়ে ঘন-ছায়া নামিয়াছে। বাড়ি ফিরিতে যাইব, দেখি নদীর ধারে চটকাতলার শ্মশানে গ্রামের প্রহ্লাদকলুর বৌ যে ছোট টিনের চালাখানা তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহারই মধ্যে কেবসিয়া আছে।

ভয় হইল, ভূত নয় তো?

একটু আগাইয়া গিয়া ভাল করিয়া দেখি ভূত নয়, পরেশ-কাকা। ঘরের মেজেতেশ্মশানের পরিত্যক্ত একখানা জীর্ণ মাদুর পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল—পয়সা আছে কাছে?

পরেশ-কাকাকে ভয় করিয়া সবাই এড়াইয়া চলে, কিন্তু আমি সাহস করিয়া কাছে গেলাম। আমি জানি পরেশ-কাকা এ-পর্যন্ত মার খাইয়াছে, মারে নাই কাহাকেও। আহা, পরেশ-কাকার পিঠে একটা দগদগে ঘা, ঘায়ে মাছি বসিতেছে, পাশে একটামালসায় কতকগুলি ডালভাত, তাহাতেও মাছি বসিতেছে।

বলিলাম—এ জঙ্গলের মধ্যে আছেন কেন কাকা? আসবেন আমাদের বাড়ি? আসুন, শ্মশানে থাকে না—

পরেশ-কাকা বলিল—দূর, শ্মশান বুঝি, এ তো আমার বৈঠকখানা। ওদিকে বাড়ী রয়েছে, দোমহলা বাড়ি। দু-হাজার টাকা জমা রেখেছি দাদার কাছে। বৌদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিনা তাই দিচ্ছে না। ঝগড়া মিটে গেলেই দিয়ে দেবে। পাঁচ বছর চাকরিকরে টাকা জমাইনি ভেবেছিস?

কত করিয়া খোশামোদ করিলাম, পরেশ-কাকা মড়ার মাদুর ছাড়িয়া কিছুতেউঠিল না।

ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম পরেশ-কাকার মামারা আসিয়া তাহাকে হুগলি লইয়াগিয়াছে।

দুই বৎসর পরে আমার উপনয়নের দিন ভোজে পরেশ-কাকাকে ব্রাহ্মণদের পঙ্‌ক্তিতে পরিবেশন করিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহার রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে, মামারা অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়াছিল, এবং অনেক পয়সাকড়ি খরচকরিয়াছিল।

কি সুন্দর চেহারা হইয়াছে পরেশ-কাকার। পরেশ-কাকা যে এত সুপুরুষ, পাগলঅবস্থায় ছেঁড়া নেকড়া পরনে, গায়ে কাদা-ধূলা মাখিয়া বেড়াইত বলিয়াই আমি বুঝিতেপারি নাই। বলিষ্ঠ একহারা গড়ন, রং টকটকে গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর; দেখিয়াখুশি হইলাম।

কিছুদিন পরে ঘটা করিয়া পরেশ-কাকার বিবাহ হইল। শুনিলাম নববধূ কলিকাতার কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বাড়ির মেয়ে। বৈকালে খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার দরুন বর-বধূর পৌঁছিতে এক প্রহর রাত্রি হইয়া গেল। আলো জ্বালিয়া বরণ হইল। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলোতে আমরা নববধূর মুখ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—এ-সব অঞ্চলে অমন সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখি নাই। সকলেই একবাক্যে বলিল—বৌ না পরী, পরেশের বহু জন্মের ভাগ্যে এমন বৌ মিলিয়াছে।

বিবাহের কিছুদিন পরে পরেশ-কাকার বৌ বাড়ি চলিয়া গেলেন। মাস-দুই পরেআবার আসিলেন।

সকালে পরেশ-কাকদের বাড়ি বেড়াইতে গেলাম। তাহাদের বাড়ির সকলে তখনকি-একটা ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছে। অনেকে আমার বয়সী ছেলেমেয়ে।

নতুন খুড়ীমা বারান্দায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছেন। জরিপাড় শাড়ি পরনে, আমাদেরস্কুলে সরস্বতী-প্রতিমা গড়ানো হইয়াছিল এবার, ঠিক যেন প্রতিমার মতো মুখশ্রী।

আমরা সামনে উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিলাম। পরেশ-কাকার বৌওখানে বসিয়া থাকাতে সেদিন আবার যেন উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ইচ্ছা হইল, কত কি অসম্ভব কাজ করিয়া খুড়ীমাকে খুশি করি। সে কি লাফঝাঁপ, কি দৌড়াদৌড়ি, কি চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলাম হঠাৎ! গায়ে যেন দশ জনের বল আসিল।

এমন সময় শুনিলাম পরেশ-কাকার বৌ বাড়ির ছেলে নেপালকে বলিতেছেন—ওই ফর্সা ছেলেটি কে নেপাল?বেশ চোখ-দুটি—

নেপাল বলিল—ওপাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ির পাবু—

পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—ডাক না ওকে?

আনন্দে আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল। মুখ আগেই রোদেছুটাছুটিতে রাঙা হইয়াছিল, এখন তা আরও রাঙা হইয়া উঠিল লজ্জায়। অথচ কিসেরলজ্জা!

গিয়া প্রথমেই একটি প্রণাম করিলাম। পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—তোমার নামকি? পাবু? ভালো নাম কি?

লজ্জা ও সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া বলিলাম—বাণীব্রত—

তিনি বলিলেন—বাঃ, বেশ সুন্দর নাম। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনিই নাম। পড়তো? বেশ, বেশ। এখানে এস খেলা করতে রোজ। আসবে?

সেরাত্রে আনন্দে আমার বোধ হয় ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই। যেন কোন্ স্বর্গের দেবী কি রূপকথার রাজকুমারী যাচিয়া আমার সঙ্গে ভাব করিয়াছেন। অমন রূপ কি মানুষের হয়।

ইহার পরদিন হইতে পরেশ-কাকাদের বাড়ি রোজ যাইতে আরম্ভ করিলাম, দিননাই, দুপুর নাই, সকাল নাই। কি ভাবই হইয়া গেল খুড়ীমার সঙ্গে। আমার বয়স তখনবারো, খুড়ীমার কত বয়স বুঝিতাম না, এখন মনে হয় তার বয়স ছিল আঠারো-উনিশ।

বিবাহের পর-বৎসর গ্রামে খবর আসিল পরেশ-কাকা বিদেশে চাকুরিস্থলে আবারপাগল হইয়া গিয়াছেন। খুড়ীমা তখন মাস-দুই হইল বাপের বাড়ি। পাগল হইবারসংবাদ শুনিয়া বাপের সঙ্গে তিনি স্বামীর কর্মস্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন পরেশ-কাকাকে পাগলাগারদে পাঠানো হইয়াছে। খুড়ীমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই, খুড়ীমার বাবা মেয়েকে পাগলাগারদে লইয়া গিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবারআগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সব ব্যাপার মিটিয়া গেলে তিনি মেয়েকে লইয়া ফিরিলেন।

পরেশ-কাকার বড় ভ্রাতৃবধূ তখন ছেলেমেয়ে লইয়া গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন, তিনিপত্র লিখিয়া পরেশ-কাকার বৌকে মাস-দুই পরে আনাইলেন। খুড়ীমার আসিবারসংবাদ পাইয়া সকালে উঠিয়াই ছুটিয়া দেখা

করিতে গেলাম। তাঁর মুখে ও চেহারায়দুঃখের কোন চিহ্ন দেখিলাম না, তেমনই হাসি-হাসি মুখ, মুখশ্রী তেমনি সুকুমার, বিদ্যুতের মতো রং এতটুকু ম্লান হয় নাই। কি স্নেহ ও আদরের দৃষ্টি তাঁর চোখে, আমিপায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়া হাসিমুখেবলিলেন—এই যে পাবু, কেমন আছ? একটু রোগা দেখছি যে!

আমি উত্তরে হাসিয়া খুড়ীমার সামনে মেজের উপরে বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—আপনি ভালো ছিলেন খুড়ীমা?

খুড়ীমা বলিলেন—আমার আর ভালো থাকাথাকি, তুমিও যেমন পাবু!

পরেশ-কাকা পাগল হইয়াছেন সে-কথা ভাবিয়া খুড়ীমার জন্য দুঃখ হইল।অভাগিনী খুড়ীমা!

খুড়ীমা বলিলেন—কাছে সরে এসে বোসো পাবু। পাবু আমাকে বড় ভালোবাসো—না?

ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম খুব ভালোবাসি।

—আমিও কলকাতায় থাকতে পাবুর কথা বড় ভাবি! পাবু, এ গাঁয়ে তোর মতোভালোবাসে না কেউ আমায়।

লজ্জায় রাঙা হইয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া থাকিতাম। তেরো বছরের ছেলে, কি কথাই বা জানি!

—কলকাতা দেখেছ পাবু?

—না, কে নিয়ে যাবে?

—আচ্ছা, এবার আমি যখন যাব এখান থেকে, নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বেশআমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবে, কেমন তো?

—কবে যাবেন খুড়ীমা? শ্রাবণ মাসে? না, এখন কিছুদিন থাকুন এখানে। যাবেন নাএখন।

—কেন বল তো?

হাসিয়া তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিলাম—আপনি থাকলে বেশ লাগে।

নতুন বামুন হইয়াছি। তখনও একাদশী ছাড়ি নাই, যদিও এক বৎসরের বেশিউপনয়ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতে খুড়ীমা নিমন্ত্রণ করিয়া আমায় খাওয়াইতেন। নিজের হাতে আমার জন্য খাবার করিয়া রাখেন, কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন নিমকি কি কচুরি, বৈকালে বেড়াইতে গেলে কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাইতে দেন।অনেক রকম ব্রত করিতেন, তাঁর ব্রতের বামুন আমিই। পৈতে ও পয়সা কত জমাহইয়া গেল আমার টিনের ছোট বাক্সটাতে।

আমিও অবসর পাইলেই খুড়ীমার কাছে ছুটিয়া যাইতাম, ছাদের কোণে বসিয়া কতআবোল-তাবোল বকিতাম তাঁর সঙ্গে। বই পড়িয়া শোনাইতাম। খুড়ীমা বেশ ভালই লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু বলিতেন—পাবু, তুই পড়ে শোনা দিকি? ভারি ভালো লাগেআমার তোর মুখে বই-পড়া শুনতে! তোর গলার সুর ভারি মিষ্টি—

আমাদের গ্রামে সে-বার 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালা হইয়াছিল বারোয়ারিতে। পালাটারমধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার একটা গান চমৎকার লাগিয়াছিল বলিয়া শিখিয়া লইয়াছিলাম, এবংবেশ ভালো গাহিতে পারিতাম।

নয়নে কখনো হেরিব না নাথ,
দেখা হবে মনে মনে।
আমার নিশীথ স্বপনে এসো
এসো তন্দ্রা আবরণে।

খুড়ীমা প্রায়ই বলিতেন—পাবু, সেই গানটা গাও তো?

গ্রামের লোকে অনেকে কিন্তু খুড়ীমাকে দেখিতে পারিত না।

আমার কানেও এ-রকম কথা গিয়াছে।

একবার রায়-বাড়ির বড়গিন্নীকে বলিতে শুনিলাম কি জানি বাপু জানি নে, ও সবকলকেতার কাণ্ড। সোয়ামী যার পাগলাগারদে, তার অত চুলবাঁধার ঘটাই বা কিসের, অত পাতাকাটার বাহারই বা কিসের, এত হাসিখুশিই বা আসে কোথা থেকে! কিবেঢং, কিবে শাড়ির রং—না বাপু, আমার তো ভালো লাগে না—তবে আমরা সেকেলেবুড়োহাবড়া, কলকেতার ফেশিয়ান তো জানিনি?

এ-রকম কথা আমি আরও শুনিয়াছি অন্য-অন্য লোকের মুখে।

মনে হইত তাদের নাকে ঘুষি লাগাইয়া দিই, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি, তাদেরবলি—না, তোমরা জান না। তোমাদের মিথ্যে কথা। তোমাদের অনেকের চেয়ে খুড়ীমা ভালো—খুব ভালো।

কিন্তু যাহারা বলে তাহারা গ্রামসম্পর্কে গুরুজন, বয়স অনেক বেশি। কাজেই চুপ করিয়া থাকিতাম।

তাঁহার চেহারা, মুখশ্রী এতকাল পরে আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে তা নয়। কেবলএকদিনের তাঁর অপূর্ব কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখ গভীরভাবে আমার মনে ছাপ দিয়াছিল।যখন সে-মুখ মনে পড়ে তখন একটি উনিশ-কুড়ি বছরের কৌতুকপ্রিয়া, হাস্যমুখীসুন্দরী তরুণীকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

সে-বার আমাদের গ্রামে কোথা হইতে এক দল পঙ্গপাল আসিয়াছিল। গাছপালা, বাঁশবন, সজনেগাছ, ঝোপঝাপ পঙ্গপালে ছাইয়া ফেলিল। খুড়ীমা ও আমি ছাদেদাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দেখিতেছিলাম—দু'জনের কেহই আর যে কখনও পঙ্গপাল দেখি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ খুড়ীমা বিস্ময়ে ও কৌতুকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিলেন—ও পাবু, দ্যাখ্ দ্যাখ্—রায়দের নিমগাছে একটা পাতাও রাখেনি, শুধু গুঁড়ি আর ডাল, এমন কাণ্ড তো কখনও দেখিনি—ও মাগো।

বলিয়াই কৌতুকে ও আনন্দে বালিকার মতো খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।তাঁর এই হাসিমুখটিই আমার মনে আছে।

বর্ষা কাটিয়া শরৎ পড়িল। আমাদের নদীর দু-ধারে কাশফুল ফুটিয়া আলো করিল। আকাশ নীল, লঘু শুভ্র মেঘখণ্ড বাদামনীর চরের দিক হইতে উড়িয়া আসে, আমাদেরসায়েরের ঘাটের উপর দিয়া, গিরিশ-জ্যাঠাদের বড় আমবাগানের উপর দিয়া শুভরত্নপুরেরমাঠের দিকে কোথায় উড়িয়া যায়...বড় বড় মহাজনী কিস্তী নদী বাহিয়া যাতায়াত শুরু করিয়াছে, কয়ালরা ধান মাপিতে দিনরাত বড় ব্যস্ত।

খুড়ীমা আমাদের গ্রামেই রহিয়া গেলেন। পরেশ-কাকও পাগলাগারদ হইতে বাহিরহইলেন না। খুড়ীমাদের বাড়ি তাঁর ননদের এক দেওর আসিল পূজার সময়, নামশান্তিরাম, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখিতে চেহারাটা ভালোই। অল্প দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়া কেন যে কুটুম্ববাড়ি ছাড়িয়া আর নড়িতে চায় না, যাইলেও অল্প দিনেরমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার কিছু কাল কাটাইয়া যায়—ইহার কারণ আমি কিছু বলিতে পারিব না—কেবল ইহা শুনিলাম যে গ্রামে তার নামের সঙ্গে খুড়ীমার নামজড়াইয়া একটা কুকথা লোকে রটনা করিতেছে। একদিন দুপুরের পরে খুড়ীমাদের বাড়ি গিয়াছি। পিছনের রোয়াকে পেঁপেতলার জানালার ধারে খুড়ীমা বসিয়া আছেন, শান্তিরাম বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া জানালার গরাদ ধরিয়া খুড়ীমার সঙ্গে আস্তেআস্তে একমনে কি কথা বলিতেছে—আমাকে দেখিয়া বিরক্তির সুরে বলিল—কি পাবু, দুপুরবেলা বেড়ানো কি? পড়াশুনো করো না? যাও এখন যাও—

আমি শান্তিরামের কাছে যাই নাই, গিয়াছি খুড়ীমার কাছে। কিন্তু আমার দুঃখ হইল যে, খুড়ীমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও বলিলেন না—আমি তখনই ওদের বাড়ি হইতে চলিয়া আসিলাম। ভয়ানক অভিমান হইল খুড়ীমার উপর—তাঁর কি একটা কথাও বলা উচিত ছিল না?

ইহার পর খুড়ীমাদের বাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ না করিলেও কমাইয়া দিলাম। খুড়ীমাকে আর তেমন করিয়া পাই না; শান্তিরাম আজকাল দেখি সময় নাই, অসময়নাই, ছাদে কি সিঁড়ির ঘরে বসিয়া খুড়ীমার সহিত গল্প করিতেছে—আমার যাওয়াটা সে যেন তেমন পছন্দ করে না। খুড়ীমাও যেন শান্তিরামের কথার উপর কোন কথাজোর করিয়া বলিতে পারেন না।

খুড়ীমার নামে পাড়ায় পাড়ায় যে-কথা রটনা হইতেছে, তাহা আমার কানেপ্রতিদিনই যায়। লক্ষ্য করিলাম, খুড়ীমার উপর আমার ইহার জন্য কোনই রাগ নাই, যত রাগ শান্তিরামের উপর। সে দেখিতে ফর্সা, বেশ শহুরে-ধরনের গোছালোকথাবার্তাও কয় বটে, শৌখিন সাজপোশাকও করে বটে, কিন্তু হয়ত তাহার ফিট্‌ফাটসাজগোজের দরুনই হোক, কিংবা তাহার শহর-অঞ্চলের বুলির জন্যই হোক, কিংবা তাহার ঘন ঘন বার্ডসাই খাওয়ার দরুনই হোক, লোকটাকে প্রথম দিন হইতেই আমিকেমন পছন্দ করি নাই। কেমন যেন মনে হইয়াছিল এ লোক ভালো না।

একদিন চৌধুরীদের পুকুরঘাটে বাঁধানো-রানায় সর্ব চৌধুরী ও কালীময় বাঁড়ুয্যে কি কথা বলিতেছিল—আমি পুঁটি-মাছ-মারা ছিপ হাতে মাছ ধরিতে গিয়াছি—আমাকেদেখিয়া উহারা কথা বন্ধ করিল। আমি বাঁধানো ঘাটে নামিয়া মাছ ধরিতে বসিলাম।সর্ব চৌধুরী বলিল—তাই তো, ছোঁড়াটা যে আবার এখানে।

কালীময় জ্যাঠা বলিলেন—বল বল, ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না।

সর্ব চৌধুরী বলিল—এখন কি করবে, এর একটা বিহিত করতে হয়। গাঁয়ের মধ্যে আমরা এমন হতে দিতে পারি নে। একটা মিটিং ডাকো। পরেশের বৌ সম্বন্ধে এমন হয়ে উঠেছে যে কান পাতা যায় না। নরেশকে একখানা চিঠি লিখতে হয় তার চাকুরির স্থানে, আর ওই শান্তিরাম না কি ওর—ওকেও শাসন করে দিতে হয়।

কালীময় জ্যাঠা বলিলেন—শাসন-টাসন আর কি—ওকে এ-গ্রাম থেকে চলে যেতে বলো। না যায় আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দাও। নরেশ কি চাকুরি ছেড়ে আসবে এখনকুটুম্বুশাসন করতে?সে যখন বাড়ি নেই, তখন আমরাই অভিভাবক।

সর্ব চৌধুরী বলিলেন—ছুঁড়িটাও নাকি বড্ড বাড়িয়েছে শুনতে পাই।

কালীময় জ্যাঠা বলিলেন—তাই তো শুনছি। বয়েসটা খারাপ কিনা। তাতে স্বামী ওই রকম।

কালীময় জ্যাঠা আমাকে যতই না বোকা ভাবুন আমার কিন্তু বুঝিতে কিছুই বাকিরহিল না। খুড়ীমার উপর অভিমান চলিয়া গেল, ভাবিলাম ইহারা হয়তো খুড়ীমাকেকোন একটা শক্ত কথা শুনাইবে কিংবা অপদস্থ করিবে। কথাটা খুড়ীমাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিলে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়াও দেখিলাম খুড়ীমাকে এ-কথাআমি বলিতে পারিব না, কোনমতেই নয়।

শান্তিরামের উপর ভয়ানক রাগ হইল। তুমি কেন বাপু এখানে আসিয়াছ পরেরসংসারের শান্তি নষ্ট করিতে? নিজের দেশে কেন চলিয়া যাও না? এতদিন কুটুম্বুবাড়ি পড়িয়া থাকিতে লজ্জাও তো হওয়া উচিত ছিল।

ইহার কিছুদিন পরে আমি কাকার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিব বলিয়া গ্রামহইতে চলিয়া গেলাম। যাইবার আগে খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। মাকেছাড়িয়া যাইতে যত কষ্ট হইতেছিল, খুড়ীমাকে ছাড়িয়া যাইতেও তেমনি।

খুড়ীমা আদর করিয়া বলিলেন—পাবু, লেখাপড়া শিখে কত বিদ্বান হয়ে আসবে, কত বড় চাকুরি করবে! মনে থাকবে তো খুড়ীমার কথা?

লাজুক মুখে বলিলাম—খুব মনে থাকবে। আমি ভুলব না খুড়ীমা।

খুড়ীমা তাড়াতাড়ি কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—সত্যি বলছিস্ ভুলবিনে কখনও পাবু?

জোর গলায় বলিলাম—কক্ষনো না।

বলিয়াই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি সজল চোখে কিন্তু হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সত্যিই বলিতেছি চলিয়া আসিয়াছিলাম নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। গ্রাম ছাড়িতেহইল বাবার কড়া হুকুমে। খুড়ীমাকে কোন ভয়ানক বিপদের মুখে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছি, আমার মন যেন বলিতেছিল।

থাকিলেই বা ছেলেমানুষ কি করিতে পারিতাম?

মাস ছয়-সাত পরে গরমেরছুটিতে বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, মাঘ মাসে শান্তিরাম খুড়ীমাকে লইয়া কোথায় চলিয়াগিয়াছে। কেহই তাহাদের কোন সন্ধান করে নাই, কোন আবশ্যক বিবেচনা করে নাই।

খুড়ীমার ইতিহাসের এই শেষ। তার পর দু-একবার খুড়ীমার সংবাদ যে নিতান্ত না পাইয়াছি এমন নয়, যেমন, একবার যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি তখন শুনিয়াছিলামআমাদের গ্রামের কাহারা চাকদায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া খুড়ীমাকে দেখিয়াছে— ভাল জামা-কাপড় পরনে, গায়ে এক-গা গহনা ইত্যাদি। আরও একবার ফার্স্ট ক্লাসেপড়িবার সময় গাঁয়ে গুজব রটিয়াছিল কাঁচরাপাড়ার বাজারে খুড়ীমার সঙ্গে আমাদের অমূল্য জেলের মা না মাসীমার দেখা হইয়াছে, খুড়ীমার সে চেহারা আর নাই, শান্তিরাম নাকি ফেলিয়া পলাইয়াছে, ইত্যাদি।

খুড়ীমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ছ-সাত বছর পরের কথা এ-সব। কিন্তু এ-সব কথার কতদূর মূল্য আছে আমি জানি না। আমার তো মনে হয় না গাঁ ছাড়িয়া যাওয়ার পরে খুড়ীমাকে কখনও কেহ কোথাও দেখিয়াছে।

যাক এ অতি সাধারণ কথা। সব জায়গায় সচরাচর ঘটিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কি আছে! তা নয়। আমার মনের সঙ্গে খুড়ীমার এই ইতিহাসের সম্বন্ধ কিন্তু খুব সাধারণ নয়। আসল কথাটা সেখানেই।

বড় তো হইলাম, কলেজে পড়িলাম, কলিকাতায় আসিলাম। বাল্যের কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি ভাব, নূতন বন্ধুলাভের জোয়ারের মুখে কোথায় মিলাইয়া গেল! খুড়ীমাকে কিন্তু আমি ভুলিলাম না। এ-খবর কি কেউ জানে, কলেজের ছুটিতে দেশে ফিরিবার সময় নৈহাটী কি কাঁচরাপাড়া স্টেশনে গাড়ি আসিলেই কতবার ভাবিয়াছি এইসব জায়গায় কোথাও হয়ত খুড়ীমা আছেন। নামিয়া কখনও অনুসন্ধান করি নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই ভাবিয়াছি তাঁর কথা। কলিকাতার কোন কুপল্লীর সহিততাঁহার কোন যোগ আমি মনেও স্থান দিতে পারি নাই কোনদিন। কেন, তাহা জানি না, বোধ হয় বাল্যে কাঁচরাপাড়া বা চাকদহে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে বলিয়া যে গুজবরটিয়াছিল, তাহা হইতেই ঐ অঞ্চলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াগিয়াছে।

কিন্তু কেন নামিয়া কখনও খুঁজিয়া দেখি নাই, ইহার কারণ আছে। আমার মনে একথা কে যেন বলিত খুড়ীমা বাঁচিয়া নাই। যে-ভুল তিনি না-বুঝিয়া অল্প বয়সে করিয়াফেলিয়াছেন, সে-ভুলের বোঝা ভগবান তাহাকে চিরকাল বহিতে দিবেন না, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা তরুণী খুড়ীমার কাঁধ হইতে সে-বোঝা তিনি নামাইয়া লইয়াছেন।

স্কুল-কলেজের যুগও কাটিয়া গেল। বড় হইয়া সংসারী হইলাম। কত নূতনভালোবাসা, নূতন মুখ, নূতন পরিচয়ের মধ্য দিয়া জীবন চলিল। কত পুরাতন দিনেরঅতি-মধুর হাসি ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত হইল, কত নূতন মুখের নূতন হাসিতেদিনরাত্রি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবনে এ-রকমই হয়। একদিন যাহাকে না দেখিলেবাঁচিব না মনে হইত, ধীরে ধীরে সে কোথায় তলাইয়া যায়, হঠাৎ একদিন দেখা গেলতাঁহার নামটাও আর মনে নাই।

মনের ইতিহাসের এই ওলটপালটের মধ্য দিয়াও খুড়ীমা কিন্তু টিকিয়া আছেন অনেক দিন। বাল্যে তাহার নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে কখনও ভুলিব না বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলাম, বালক-হৃদয়ের সেই সরল সত্য বাণীর মান ভগবানই রাখিয়াছেন।

কিসে জানিলাম বলি। আমাদের গ্রাম হইতে খুড়ীমা কতকাল চলিয়া গিয়াছেন।পঙ্গপালও আর কখনও তার পরে আমাদের গ্রামে আসে নাই—কিন্তু রায়েদের সেই নিমগাছটি এখনও আছে। বেশি দিনের কথা নয়— বোধ হয় গত মাঘ মাসের কথা হইবে—রায়দের বাড়ি জমিজমা সম্পর্কে একটা কাজে গিয়া সীতানাথ রায়ের সঙ্গে একখানা দরকারী দলিলের আলোচনা করিতেছি—হঠাৎ নিমগাছটায় নজর পড়াতেকেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেলাম। বহুদিন এদিকে আসি নাই। বাল্যের সেই নিমগাছটা।পরক্ষণে দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের এক হাস্যমুখী বালিকারকৌতুক ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত মুখ মনে পড়িল এবং নিজের অলক্ষ্যেতে

মনটা এমনএকটা অব্যক্ত দুঃখে ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল যে দলিলের আলোচনায় কোন উৎসাহইখুঁজিয়া পাইলাম না, দেখিলাম, খুড়ীমাকে তো এখনও ভুলি নাই।

বয়স হইয়াছে, মনে হইল মোটে আঠারো-উনিশ বছর বয়স ছিল খুড়ীমার! কিছেলেমানুষই ছিলেন!

মানুষের মনে মানুষ এই রকমেই বাঁচিয়া থাকে। গত ছাব্বিশ বছরের বীথিপথবাহিয়া কত নববধূ গ্রামে আসিয়াছেন, গিয়াছেন—কিন্তু দেখিলাম ছাব্বিশ বছরআগেকার আমাদের গ্রামের সেই বিস্মৃতা হতভাগিনী তরুণী বধূটি আজও এই গ্রামেবাঁচিয়া আছেন।